Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 59-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আবুল ফজলের কথা সাহিত্যে নারীভাবনার পরিচয়

খাদিজা খাতুন
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Abul Fazal, one of the great 20th century factionalist. He believed that only a writer could be able to express truth in society through his writings. In his many novel's and short stories, Abul Fazal has society. Skillfully expressed the truth of the society. Especially in his multiple essays, he gives realistic biographics of women. The lack of education, economic and social inequality in Bangladesh has put women in extreme distress. His sign are found in the novel 'chouchir'. In her novel 'purush o potongo' has come to light. The story 'Maa' depicts the plight of women in religious conservation. His works have been published in a realistic way to oppose caste, prejudice, shariyoti law, illiteracy, blockade and English education responsible for the plight of muslim women.

Keyword: Adversity, Pathetic, Dependent, Self-respect, Opposing, Prejudice, Shariyat, Muslim Society, Rebukes, Suicide.

মূলপ্রবন্ধ: বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কথা সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল অন্যতম। সাহিত্যিক আবুল ফজল খুব বেশি লেখনির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেননি। তাঁর অল্প কিছু লেখনির মধ্যে দিয়েই, তাঁর অনন্য প্রতিভা আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন। আবার অল্প লেখনির মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, একজন সাহিত্যিকই নির্মমভাবে সমাজের সত্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্মের ঊর্ধে উঠতে পারেন না, কিন্তু একজন সাহিত্যিক ধর্ম-দেশ-জাতি সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে অবাধ বিচরণ করতে পারেন। এখানেই একজন ধার্মিক ও একজন সাহিত্যিকের পার্থক্য বোঝা যায়।

আবুল ফজলের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— 'জীবনপথের যাত্রী', 'রাঙ্গাপ্রভাত' (১৩৬৪), 'চৌচির' (১৯৩৪), 'মাটির পৃথিবী' (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), 'আয়েশা', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), 'সাহসিকা' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য অসংখ্য ছোটগল্পগুলি- 'মা' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'পরদেশিয়া', 'জয়' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'জনক', 'সংস্কারক' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'শরিফ', 'সিতারা', 'বিবর্তন', 'পরিণাম', 'দ্বিতীয়বার' ইত্যাদি। আবুল ফজলের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হল 'চৌচির'। এই 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নারী সমাজের দুর্দশাময় করুণচিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সমগ্র নারী সমাজকে এক ভয়ঙ্কর অসহনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়, তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে পাই। নারী হয়ে জন্মানো যেন এক কঠিন অপরাধ। সাহিত্যিক আবুল ফজলের এই ভাবনা শুধুমাত্র তাঁরই নয়, সমকালীন অন্যান্য একাধিক সাহিত্যিকদের

রচনায় তা উঠে এসেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীরপত্র', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তেও আমরা নারীর অসহায় বেদনার চিত্র ফুটে উঠতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' এ মৃণাল এবং বিন্দু, 'দেনাপাওনা'র নিরূপমা 'চৌচির'-এর বেগম সাহেবা জাহানারা, রওশনা প্রত্যেকেই সামাজিক অনুশাসন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। সেদিনকেও বাঙালি সমাজের নারীদের চোখবুজে আত্মক্রন্দন ছাড়া কোনো কিছুই করার ছিলনা। কারণ নারী শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটেনি, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিলনা। নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন সোপান তার সামনে সেইভাবে উপস্থিত হয়নি। নারীকে থাকতে হয়েছে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পদদলিত হয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনকার সংবাদ মাধ্যমগুলিতে একের পর এক নারী নির্যাতনের, নারীদের প্রতি অত্যাচারের বহুমাত্রিক দৃশ্য উঠে আসছে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসেবে তা আমাদের মনে এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। আমাদের তখন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বেগম রোকেয়া, আবুল ফজল প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার প্রাসঙ্গিকতা। আবুল ফজলের 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে, নারী হয়ে জন্মানোই যেন তার অপরাধ। লেখকের মনে সৃষ্টি হয়েছে, নারী নির্যাতনের একরাশ যন্ত্রণা ও আক্ষেপ। একজন মানুষ যা যা পেলে খুশি হয়, বেগম সাহেবার তার সবকিছুই ছিল। পুত্র-কন্যা, রূপগুন সম্পন্ন স্বামী এবং অঢেল সম্পত্তি, কিন্তু বেশিদিন এই সুখ তার সহ্য হয়নি। স্বামীর অকালমৃত্যুতে বেগম সাহেবার জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। একজনের অকাল প্রয়াণে কীভাবে একজন নারীর জীবনে ও তার পরিবারের প্রতি সামাজিক, ধর্মীয় অনুশাসন কত কঠিন এবং নির্মম হতে পারে, তা বেগম সাহেবা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নিজের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তির প্রতি তার যেন কোন অধিকার নেই। পুত্র কন্যার চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত অন্যের কাছে নির্ভরশীল থাকতে হয়।

বেগম সাহেবা জানেন প্রতিবেশি উকিল বরোদা বাবুর বিধবা কন্যা আধুনিক শিক্ষার জোরেই সে যে আজ সমস্ত কাজ নির্ভীকভাবে করতে পারে। কিন্তু বেগম সাহেবা তা পারে না, কারণ বেগম সাহেবার পিতা-মাতা তাকে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। বেগম সাহেবা বোঝেন আধুনিক শিক্ষা না থাকার ফলেই তার জীবনে আজ চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। তার দুর্বলতার এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়েই একজন বেতন ভোগী সামান্য কর্মচারী ফকির সাহেব তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব যে বাধ্যতামূলক তা বুঝতে বেগম সাহেবার অসুবিধা হয়না। বেগম সাহেবা বুঝতে পারেন যে, তার সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে নেবার তাগিদেই সামান্য কর্মচারীর (ফকির সাহেব) বিবাহের এই অভিসন্ধি। বেগম সাহেবার অর্থতেই সামান্য এই কর্মচারী (ফকির সাহেব) ক্রমশ নিজে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে থাকে। সঠিক চিকিৎসার অভাবে বেগম সাহেবার একমাত্র পুত্র মারা যায়। একপ্রকার জোর করে কর্মচারীর (ফকির সাহেব) আগের পক্ষের সন্তান হামিদের সঙ্গে বেগম সাহেবার অসম্মতিতেও কন্যা জাহানারার বিবাহ দেওয়া হয়। এই সমাজে নারীদের রুচি, শিক্ষা, চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না।

বেগম সাহেবার তুলনায় তার কন্যা জাহানারা অনেক বেশি প্রতিবাদী, তা লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসের অভ্যন্তরে। জাহানারা ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র, মুসলিম নারী সমাজের কাছে দৃষ্টান্তমূলক মনে হয়েছে। জাহানারা তার স্বামীর (হামিদ) পছন্দের পাত্রের সাথে নিজের কন্যা রওশনার বিবাহ দিতে দেননি। জাহানারা রওশনার বিবাহ হামিদের অসম্মতিতে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও এ বিয়ে হয়নি কারণ, রওশনা মারা গিয়েছিল।

তৎকালীন সময়ে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ভন্ডামি, কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অবরোধ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা প্রভৃতি মুসলিম সমাজকে নানাভাবে পিছিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। 'শরিয়ৎ' এর নাম করে মুসলিম সমাজে পতিরা কীভাবে কলিমুদ্দীনের উপর অত্যাচার করে সেই উদাহরণ ঔপন্যাসিক আবুল ফজল পাঠককুলের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন—

> *"কয়েকদিন হইতে কলিমউদ্দীনের স্ত্রী প্রসব বেদনায় ভুগিতেছিল, গ্রাম্য ধাইরা তাহাদের বিদ্যা শেষ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কিছুতেই প্রসব করাইতে পারে না, মরনোন্মুখ স্ত্রীর দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কলিমউদ্দীন পুরুষ ডাক্তার আনিয়া তাহার প্রসব করাইয়াছে- এই তাহার অপরাধ।"*[১]

উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন কত কঠোর ছিল, তা আমাদের সামনে প্রকটিত হয়। তসলিমের মনে হয়েছে কলিমউদ্দীন কোন অপরাধ করেনি, কারণ, প্রসব যন্ত্রণায় কলিমউদ্দীনের স্ত্রী এবং সন্তান মরে যেতে বসেছে এই রকম পরিস্থিতিতে পুরুষ ডাক্তার ডাকা কোন অপরাধ নয়। তসলিম মনে করে ধর্মীয় অনুশাসনের চাইতেও প্রসূতী ও সন্তান এবং জীবনের মূল্য অনেক বেশি। মুসলিম সমাজ পতিদের চোখে তসলিম অপরাধী কিন্তু তসলিম সমাজ পতিদের অপরাধী তকমা অগ্রাহ্য করে মসজিদের পাশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। সে বুঝতে পারে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া এই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুসলিম গ্রাম্য সমাজের অশিক্ষা, ধর্মীয় কুশিক্ষা, অন্যান্য-এর মূলে কষাঘাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবুল ফজলের 'চৌচির' উপন্যাসটি পড়ে একখানি ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে আবুল ফজলকে বলেছিলেন—

> *"আপনার 'চৌচির' আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েচি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে-এর প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা করে রইলুম।"*[২]

সমকালীন মুসলিম সমাজের নারীদের নিদারুণ অসহায়তার চিত্র আবুল ফজলের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। যেমন- 'প্রদীপ ও পতঙ্গ', 'সাহসিকা', 'আয়েশা', 'মাটির পৃথিবী' ইত্যাদি। আবুল ফজল 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা কতটা অসহায় তার উল্লেখ করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নারীকে দেখানো হয়েছে, পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের ইচ্ছাধীন খেলার পুতুলের মতো। যখন প্রয়োজন তখন নারীকে ব্যবহার করে, যখন প্রয়োজন নেই তখন নারীকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রেম ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, সহানুভূতি, মমত্ববোধ সবকিছুই যেন নারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় মানবিকতাহীন অনুভূতি শূন্য এক নিষ্ঠুর নির্মম পুরুষ সমাজের অন্তঃসার শূন্য কঙ্কাল চিত্র। নারীরা শুধুমাত্র নির্যাতিত বা নিপীড়িতই নয়, তারা পদদলিত ও অবহেলিত। ঔপন্যাসিক আবুল ফজল অসাধারণ কৃতিত্বে নারী সমাজের এই সকরুণ চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, যা সত্যি এক অভিনব প্রচেষ্টা। আবুল ফজলের অভিনব চিন্তা তরুণ সমাজের কাছে নারী জাতির এই করুণ দশার চিত্র রোমহর্ষক ও বিস্ময় মনে হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষিতেও নারী জাতির প্রতি বিভিন্ন অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, নিপীড়ন চলছে। এই অত্যাচার সর্বাংশে পুরুষ কর্তৃক হচ্ছে এমনটা নয়, নারী কর্তৃক নারীদেরও নানা অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা, অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজের নারীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং অবহেলার ইতিহাস বিভিন্নভাবে কথিত ও রচিত হয়ে আছে।

আবুল ফজল শুধুমাত্র উপন্যাসেই নয়, তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যেও সমকালীন সমাজে ঘটে যাওয়া নানা যন্ত্রণার প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। ঔপন্যাসিক আবুল ফজল নিজেও উল্লেখ করেছেন—

> *"শুধু গল্পের খাতিরে গল্প আমি খুব বেশি লিখিনি। সাহিত্যের যে এক বিশেষ সামাজিক ভূমিকা আছে গোড়া থেকেই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল। ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন অভ্যস্ত চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা বা জানা তা নেহাৎ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সাহিত্য আর শিল্পের আলোয় জানাই হচ্ছে যথার্থ জানা।"*[৩]

তাঁর গল্পে মুসলিম মহিলা সমাজের এক ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে। একদিকে বোরখার ঘেরাটোপ তার উপরে ‘শরিয়ৎ’ আইনের আরোপ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কিন্তু যে পুরুষরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনুভূতি প্রবন তারা নারীদের এই দুর্দশা দেখে বেদনা অনুভব করেছেন এই বিষয়টিও উঠে এসেছে তাঁর লেখনির মধ্যে। এছাড়াও মুসলিম সমাজের মধ্যে নানান রকম জাত পাতের বিভেদ রয়েছে। আবুল ফজল তাঁর গল্পে সেই সমস্যাকেও তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে মুসলিম সমাজের মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে যে দিকগুলি দায়ী বিশেষত জাতপাত, কুসংস্কার, ‘শরিয়ৎ’-ই আইন এই বিষয়গুলিও আবুল ফজল নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

নারীদের মর্মান্তিক চিত্র উঠে এসেছে, তাঁর ‘মা’ ছোটো গল্পে। এই গল্পের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ভণ্ডামির এক সকরুণ চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পে অভিজাত হামিদ বিয়ে করে এক অখ্যাত পরিবারে। মা বাবা সকলেরই এ বিয়েতে অমত ছিল, তা সত্ত্বেও আয়েশাকে বিয়ে করে সে সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক চাপে সে আর একটি বিয়ে করবে বলে স্থির করে কিন্তু বিয়ে করতে হলে যে আগে, আগের পক্ষের বৌকে তালাক দিতে হবে সে কথা তার মাথায় আসেনি। যাই হোক সব মিলিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হয়। এদিকে বিয়ের দিন আয়েশাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাপের বাড়িতে রেখে আসে। তারপরে তার নতুন বউ জমিলা দুটো বাদি নিয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। জমিলা বেশ কিছু দিন পর জানতে পারে হামিদ তার আগের স্ত্রীকে তালাক দেয়নি ফলে সে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়। এদিকে হামিদও আবার আয়েশাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। অপরদিকে তার আত্মীয়েরা নানা রকম চক্রান্ত করতে থাকে ইসলামিক আইনের সাহায্য নিয়ে। মৌলবীরা সিদ্ধান্ত করে, আয়েশাকে নিয়ে ঘর করলে হামিদকে তারা একঘরে করবে। তখন হামিদ ও আয়েশার চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়। ইসলামিক শুদ্ধতা রক্ষা না করে ‘শরিয়ৎ’কে সঙ্গী করে অসাধু ধর্ম ব্যবসায়ীরা কীভাবে মানুষের উপর ধর্মের খাড়ার আঘাত করতে পারে তার নিষ্করুন উপাখ্যান এ গল্পে আছে।

আবুল ফজল ‘পরদেশীয়া’ গল্পে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বাঙালি মুসলিম মেয়েরা যে খুব খারাপ অবস্থায় আছে তা উল্লেখ করেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজের মেয়েরা ধর্মীয় গোড়ামি, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার কারণে প্রতিদিন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে তার উল্লেখ গল্পের মধ্যে দিয়ে করেছেন। মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথা নারীদের আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, অপরদিকে অশিক্ষা কুসংস্কারও নারী সমাজকে নিমজ্জিত করেছে তার উল্লেখ গল্পকার করেছেন ‘পরদেশীয়া’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে। মুসলিম নারীদের যন্ত্রণাকে আবুল ফজল জীবন্ত করে তুলেছেন। ‘জয়’ গল্পের মধ্যে দিয়েও আবুল ফজল মুসলিম সমাজের শিয়া ও সুন্নী এই দুই শ্রেণির প্রভেদ উল্লেখ করেছেন। এই দুই শ্রেণির বিভেদ কী রকম ভয়ঙ্কর হতে পারে তার সুকরুণ বাস্তব চিত্র ‘জয়’ ছোটো গল্পের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। বি.এ. পাশ করা যুবক সিরাজের কাছে বিবাহ এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না কারণ অশিক্ষিত মুসলিম মহিলাদের তুলনায় ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত মেয়েদেরকে সে বেশি পছন্দ করত। রক্ষণশীল পিতা ও মুসলিম সমাজের অলংকার ভারাক্রান্ত অশিক্ষিত মেয়েগুলির প্রতি সিরাজ বিবাহের বোধ করত না। সিরাজের মনে হত ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান মেয়ে কী বিয়ে করা যায় না? এই সময় একদিন অধ্যাপক আমিনের মেয়েকে সিরাজের খুব ভালো লাগল, কারণ মেয়েটা শিক্ষিত ও অলংকার বোধ ছিল। সিরাজের পছন্দ করা ঐ মেয়ের সাথে তার বাবা তার বিয়ের আয়োজন করে। তার পিতা হাজী সাহেব ধর্মাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রচার করতেন সব মুসলিম ভাই ভাই তাদের মধ্যে প্রভেদ নাই। ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী এই হাজী সাহেব যে কতখানি ভণ্ড, তা ধরা পড়ে যায় সিরাজের বিয়ের সময়। হাজী সাহেব যখন জানতে পারেন তার পুত্রবধূর পিতা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত তখন বিবাহ স্থান থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হবার কারণে সিরাজের এই বিবাহ হল না, বিবাহ স্থল থেকে সিরাজকে ফিরে আসতে হল। একজন নারীর করুণ অবস্থার জন্য ধর্মের বিভেদ, গোড়ামী তথা নিষ্ঠুরতার চিত্র গল্পকার আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

জমিদার শ্রেণি, ব্যবসায়ী ও মৌলবীরা মুসলিম ধর্মের নামে কীভাবে মানুষকে শোষণ করে ও নারীকে ভোগ করে তার উল্লেখ করা আছে 'জনক' গল্পে। একজন বড় ব্যবসায়ী ও জমিদার হলেন সৈয়দ আব্দুল আলিম চৌধুরী। গল্পের শুরুতেই আমরা জানতে পারি, তিনি একজন পাক্কা মুসলমান, সুন্নতের বল খেলাপ কম করেন। সেই জমিদারের চারটি স্ত্রী। জমিদারের চারটি স্ত্রী রাখা জমিদারী ও ধর্ম বিরুদ্ধ কোন কাজ নয়। এখানে দেখা যায় একজন মধ্য বয়স্কা মেয়েকে (ফতেমা) জমিদার বিবাহ করেছে অন্যান্য স্ত্রীর মতো সে যখন সম্পত্তির দাবী করে তখন তাঁকে দেখে নেব বলে হুমকি দেয়। ফতেমার একমাত্র সাক্ষী যিনি তাগদ পড়িয়েছিলেন, সেই মৌলবী জমিদারের অর্থের কাছে বশীভূত হয়ে যায় সব সত্যকে বিসর্জন দিয়ে। মৌলবী আদালতে জানিয়ে দিল, এই বিবাহের কিছুই সে জানেনা। নিরুপায় ফতেমা তার বালকপুত্রকে নিয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ালো এবং স্তম্ভিত শিশুপুত্রটিকে চৌধুরী সাহেবের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে তুলে ধরলো। কিন্তু আদালতের জজ সাহেব জানালেন আইন বেআইনি পুত্রকে স্বীকার করে না। মুসলিম সমাজের মৌলবী জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণির অর্থ ও বাহুর ক্ষমতার কাছে নারীদের শুধুমাত্র নির্যাতনই নয়, নিপীড়নই নয়, তার সঙ্গে অনেক অপমান, লাঞ্ছনা, অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। আবুল ফজল 'জনক' গল্পটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের জমিদার ব্যবসায়ী শ্রেণির মুখোস আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন। আবুল ফজল একাধিক গল্পের মধ্যে দিয়ে নারী হৃদয়ের অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। 'শরীফ' গল্পের মধ্যে দিয়েও পর্দাপ্রথার ও বাল্য বিবাহের কুফলের প্রতি লেখক অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে যেখানে উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন, সেখানে বালিকার সম্মতি যেন প্রহসনের মতো। মেয়েদের বিবাহের বয়সে না পৌঁছাতেই অনেক মুসলিম মেয়েদের জোর করে বিবাহ দেওয়া হত। যেখানে কন্যার সম্মতি থাকত না সেখানে অভিভাবক সম্মত হতেন। এখানে বিবাহ শর্ত লংঘিত হতো মুসলিম আইন মানতে গেলে বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কেই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হয়। তবে এখানে পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও নারী প্রায় সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। সোহাগীর বিয়ে হয়েছিল, মাত্র ১১ বছর বয়সে। এই সকল করুণ পরিণতিকে মেনে নিয়ে মুসলিম নারীদের সংসার ধর্ম পালন করতে হয়, আজীবন ধরে। যারা এই কষ্ট যন্ত্রণা অপমান সহ্য করতে পারে না, তারাই মৃত্যুকে একমাত্র পথ ভেবে আত্মহত্যা করে। কী সোহাগী, কী নিরুপমা, কী কুন্দনন্দিনী, কী বিন্দু তারা অন্য কোন লড়াই পথে না গিয়ে, মৃত্যুই একমাত্র পথ বলে মনে করেছে।

হিন্দু বা মুসলিম নারী সমাজ বলে নয়, নারী মাত্রই নিপীড়ন, নির্যাতন, অবহেলার শিকার। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে নারীর এই দুর্বিষহ যন্ত্রণার ছবি আমাদের সম্মুখে উঠে এসেছে। আবুল ফজল বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালের পূর্বেকার সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচার, অবিচার নিষ্ঠুর ধর্মাদেশ তাঁর লেখনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনি ছিল যথেষ্ট ক্ষুরধার ও আকর্ষণীয়। পাঠকবর্গকে আকর্ষণীয় করার প্রয়াস। তাঁর এই প্রয়াস যথার্থ সার্থক। এই প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম 'চৌচির' উপন্যাসের অসাধারণত্বে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—

> *"আবুল ফজল একমাত্র মুসলমান গল্পী যাকে বর্তমান বাঙলার শক্তিশালী গল্প লিখিয়েদের মধ্যে সম আসন দেওয়া যায়। ...এই তরুণ শিল্পীর মাঝে যে বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছি, 'চৌচির' তার অগ্রদূত।"*[৪]

তথ্যসূত্র :

১। আজাদ আলউদ্দিন আল সম্পাদিত 'আবুল ফজল রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) 'চৌচির' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১০০০, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২২-২৩
২। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা নং ৫৬৯ পত্রখানি লিখিত হয় ০৬-০৯-১৯৪০
৩। আজাদ আলউদ্দিন আল সম্পাদিত 'আবুল ফজল রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১০০০, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৭
৪। আজাদ আলউদ্দিন আল সম্পাদিত 'আবুল ফজল রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) 'চৌচির' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১০০০, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩